নাস্তিকের গীতাঞ্জলি : কাব্যে এবং দর্শনে আবু সয়ীদ আইয়ুব

রণজিৎ দাশ

আবু সয়ীদ আইয়ুব রচিত অসামান্য গ্রন্থগুলির যে-কোনও একটি পৃষ্ঠ পড়লেই আমার মনে একটি নাছোড়বান্দা প্রশ্ন উঁকি দেয়। প্রশ্নটি এই যে আবুয় সয়ীদ আইয়ুবকে আমরা কী রূপে দেখব? একজন দার্শনিক রূপে, না একজন কাব্য - সমালোচক রূপে? অর্থাৎ একজন শাস্ত্রজ্ঞ দার্শনিক, তাঁর কাব্যানুরাগ -বশত, কাব্য - সমালোচনার কর্মে ব্রতী হয়েছেন এবং কৃতী হয়েছেন, এ-ই কি আইয়ুবের সঠিক পরিচয়? না কি, একজন রসঙ্গ কাব্য- পরিকাঠামোর বিস্তৃত ব্যবহার করেছেন, এটাই তাঁর সঠিকতার পরিচয়? এই মৌল ধন্দটি আমার মনে আনে একটি দার্শনিক প্যারাডক্স -এর আভাস। সেই প্যারাডক্সটির আলোচনায় আমরা একটু পরে যাব। আপাতত যদি এই ব্যাপারটাকে একটু সহজভাবে দেখি, তাহলে দেখতে পাই যে, আইয়ুবের লেখক সত্তার মধ্যে তাঁর কাব্য - সমালোচক - সত্তার এবং তাঁর এবং তাঁ দার্শনিক - সত্তার মিশ্রণ ঘটেছে, এবং সেই মিশ্রণটি একটি বিষম মিশ্রণ। কারণ ভাব এবং যুক্তির মিশ্রণ, বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে, সর্বদাই বিষম। এই মিশ্রণের ফলে কাব্য - সমালোচক আইয়ুব অনেকাংশে—লাভবান হয়েছেন, কিন্তু দার্শনিক আইয়ুব সর্বাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাঁর কাব্য - আলোচনার পাতায় পাতায় এই লাভ - ক্ষতির দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। আমি একটি দৃষ্টান্ত এখান দিই। 'পথের শেষ কোথায়' গ্রন্থটির নাম-প্রবন্ধে আইয়ুব রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতাটির ব্যাখ্যা করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন সেই বিখ্যাত পঙক্তিটির : 'তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর,/ এখনই অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।' এই ব্যাখ্যানে আইয়ুব বলেছেন, 'আমার প্রশ্ন হচ্ছে; সারাদিন উড়ে (কবি) 'অন্ধ' বলেছেন কেন? ...'অন্ধ' - এর অর্থ কি তবে এই যে জন্মসূত্রে পাওয়া পশুসুলভ অন্ধ প্রবৃত্তিগুলি মনুষ্য দেহমনকে এখনও আঁকড়ে রেখেছে, আমরা তা ছাড়িয়ে উঠতে পারিনি বেশি দূর? দ্বিতীয়ত, জাগতিক নিয়মকে ন্যায়ের রাজ্য বলা যায় না এখনও। কোনোদিনই বলা যাবে না হয়তো, কারণ নিয়মের রাজ্য (naturalorder) এবং নীতির রাজ্য (moral order) ভিন্ন পর্যায়ের ব্যাপার, পরস্পর বিরোধী না হলেও পরস্পর নিরপেক্ষ। বরঞ্চ বলা উচিত যে বিজ্ঞানীদের ঐকান্তিক সাধনার ফলে নিয়মের রাজ্য যতোই আমাদের চোখের সামনে উদঘাটিত হচ্ছে এবং পূর্ণতর রূপ গ্রহণ করছে, আমরা ততোই নীতির রাজ্যের খণ্ডিত প্রকাশ দেখে ক্লিষ্ট হচ্ছি, হতাশায় ভেঙে পড়ছি। ...উষা থেকে বিকাল পর্যন্ত বিহঙ্গ যে-দিন পেরিয়ে এলো সেটা ছিল জ্ঞানের যুগ। তাঁর স্বাশ্রয়ী (intrinsic) মূল্য এবং বিশুদ্ধ আনন্দময়তা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করছেন না। তবে হতাশ বোধ করছেন জ্ঞানের সঙ্গে সার্বিক কল্যাণের অতি অপূর্ণ অন্বয় দেখে। সমন্বয় পূর্ণ হবে যে উষার তারই প্রতি চেয়ে আছেন সব ক্লান্তিকে উপেক্ষা করে। উষা-দিশাহারা আকাশের ঘনীভূত তিমির যেন শ্বাসরোধ করছে কবির।

কিন্তু মানুষের জ্ঞান কোনোদিন পূর্ণ হবে না, পরহিতৈষণাও সীমিতই থাকবে। জড়বুদ্ধি ও স্বার্থপরতা মানবত্বের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানুষ পশুত্ব থেকে দেবত্বের দিকে অতি মন্থর গতিতে উত্থান-পতন-বন্ধুর পথে এগিয়ে চলবে, এর বেশি কিছু আশা করা যায় না। পশুত্ব যেমন মানুষকে নিচের দিকে ঠেলছে বা আটকে রাখছে, দেবত্ব তেমনি উপরের দিকে টানছে।'

'অন্ধ' শব্দটির মর্মোদ্ধারে আইয়ুবের এই উদ্ধৃত ব্যাখ্যার যুক্তি-পরম্পরার দুটি অংশ। প্রথম অংশটি দর্শনভিত্তিক এবং দর্শন - সম্মত, যেখানে আইয়ুব মানুষের 'জন্মসূত্রে পাওয়া পশুসুলভ অন্ধ প্রবৃত্তিগুলি'-র কথা বলেছেন, বলেছেন যে 'নিয়মের রাজ্য (natural order) নীতির রাজ্য (moral order) ভিন্ন পর্যায়ের ব্যাপার, পরস্র - বিরোধী না হলেও পরস্পর - নিরপেক্ষ' (এটি একটি বিতর্কমূলক দার্শনিক মত, কিন্তু দর্শনচর্চার রীতিসম্মত), এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে ক্রমশই 'নীতির রাজ্যের খণ্ডিত প্রকাশ' দেখে আক্ষেপ ও অতাশা প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় অংশটি সম্পূর্ণ বিপরীত; এটি একটি দর্শন- বিগার্হিত, অতি পুরাতন মেটাফিজিক্যাল বাণী, যে বাণীটি, আইয়ুবের ভাষায়, 'মানুষ পশুত্ব থেকে দেবত্বের দিকে অতি মন্থর গতিতে উত্থান-পতন -বন্ধুর পথে এগিয়ে চলবে, এর বেশি কিছু আশা করা যায় না। পশুত্ব যেমন মানুষকে নিচের দিকে ঠেলছে বা আটকে রাখছে, দেবত্ব তেমনি উপরের দিকে টানছে।'

—কী কাণ্ড! দার্শনিক আইয়ুব, দর্শনচর্চার Inttellectualrigour-এ পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী আইয়ুব, যদি একবার সচেতনভাবে ভাবতেন যে তাঁরই কলম থেকে 'পশুত্ব নিচের দিকে ঠেলছে, দেবত্ব উপরের দিকে টানছে'—এ জাতীয় দুর্বল, অদার্শনিক ভাষা বেরিয়েছে, তাহলে তিনি নিশ্চিতই সঙ্কোচে শিহরিত হতেন; কিন্তু কাব্য - সমালোচক আইয়ুব এই বাণী এবং এই ভাষা বলে নির্বিবাদে পার হয়ে গেলেন, কারণ কাব্যের জগৎ যুক্তির নয়, ভাবের জগৎ, সেখানে জোতীয় ভার্টিক্যাল ভাবোক্তির ছড়াছড়ি। কিন্তু এই দুটি নিতান্ত পরস্পর বিরোধী অংশের—দার্শনিক এবং অন্যটি ছদ্ম-দার্শনিক অংশের — সহাবস্থানে কী ঘটল? ঘটল এই যে, এর দ্বারা আইয়ুবের কাব্য- সমালোচনাটি একটি দার্শনিক অংশটির দ্বারা ছদ্ম-দার্শনিক অংশের - সহাবস্থানে কী ঘটল? ঘটল এই যে, এর দ্বারা আইয়ুবের কাব্য সমালোচনাটি একটি দার্শনিক উচ্চতা এবং মর্যাদা লাভ কল, সাধারণ পাঠকের চোখে দার্শনিক অংশটির দ্বারা ছদ্ম - দার্শনিক অংশটি যেন-বা প্রতিপন্ন হল (!) ফলত কাব্যপ্রেমীর মন 'পশুত্ব - দেবত্ব' -রে গৎ বাঁধা আশাবাদে আবার অনুরঞ্জিত হল; পরিবর্তে আইয়ুবের প্রকৃত দার্শনিক সত্তা আত্ম - ভ্রষ্ট এবং মলিন হল। এককথায়, কাব্যের পূজায় দর্শনের বলি হল।

(প্রসঙ্গত বলি, আইয়ুব নিজেই বিশ্বের সমালোচনা - সাহিত্যের বহু প্রতিষ্ঠিত উক্তির অন্তর্নিহিত পরস্পরবিরোধিতা শাণিত যুক্তিতে উদঘাটন করেছেন। একটি শ্রেষ্ট দৃষ্টান্ত, তিনি তাঁর Poerty and Truth গ্রন্থের 'Emotive Theory and I.A Richards' শীর্ষক প্রবন্ধে ওয়ার্ডসওয়ার্থ -রে সেই জগদ্বিখ্যাত দু'লাইনের কবিতা সংজ্ঞাটিকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন এই বলে, 'Wordsworth's full statement regarding poetry is : 'I have said that poetry is the spontaneous overflow of powerful felling; it takes its origin from emotion recollected in tranquility.' It is unnecessary to point out that the second part of the statement contradicts the first.' এমনই ক্ষুরধার, অনায়াস, iconoclastic মনন ছিল আইয়ুবের)।

সুতরাং, এ প্রবল দর্শন প্রেমী াইয়ুরে এক মুগ্ধ ভক্ত হিসাবে, এবং প্রবল দর্শন - বিরোধী বাঙালি জাতির এক অযোগ্য সন্তান হিসাবে, সভয়ে জানাই যে যদিও দর্শনে আমরা জ্ঞান অত্যল্প, কিন্তু প্যাশন অত্যধিক। এবং আইয়ুবের প্রতিটি রচনার ছত্রে ছত্রে তাঁর দর্শনের প্রতি তীব্র প্যাশন টের পাই আমি, তাঁর মধ্যে এক গবীর সম্ভাবনাময় দার্শনিকের দেখা পাই এবং এ-ও বুঝতে পারি বিশেষ - কিছু রবীন্দ্রকাব্যে এবং রবীন্দ্রগানে তাঁর জীবনভর তন্ময় অনুরাগের কারণও হল সেইসব কাব্যে ও গানে সঞ্চারিত রবীন্দ্রনাথের নিজের দর্শন-জিজ্ঞাসার তীব্র প্যাশন। আমি স্পষ্ট বুঝি যে দর্শনের মাত্রায় এবং মুদ্রায় যাচাই না করে মানবমনের কোনও চিন্তা, কল্পনা এবং অনুভূতিকে াইয়ুব তাঁর চেতনালোকে গ্রহণ করতে অক্ষম; এতটাই সহজাত দার্শনিক কাঠামোয় তৈরি তাঁর মন। এজন্যই, রবীন্দ্রকাব্যের পূজায় আত্মবলিদানকারী দার্শনিক আইয়ুবের প্রতি আমার এত টান। এজন্যই, আমি অত্যন্ত বিষণ্ণবোধ করি, যখন পরি দর্শন - বিমুখ বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এসে পড়ে এই কড়া ধাতুর দার্শনিক মানুষটির নিঃসঙ্গতা ও দুর্দশার কারণ বর্ণনা। 'পথের শেষ কোথায়' বইটির 'মুখবন্ধ' - তে তিনি লিখেছেন, 'আমার বাঙলা শিক্ষায় আবার ছেদ পড়লো প্রেসিডেন্সি কলেজে Physics Honours পড়তে। ...আমি বরাবরই জানতাম যে দর্শনই হবে আমার অধ্যায়ন-অধ্যাপনার বিষয়। ...(Physics M.Sc.-তে) দুটো পেপার পরীক্ষা দেবার পরই আমাশয়ে প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়ে পরীক্ষাশেষ না করেই দর্শন বিভাগে প্রবেশ করলাম এবং পাশ করেই একটি গবেষণাবৃত্তি পেলাম; বিষয় নির্বাচন করলাম 'Content of Error in Perception and Thought'। বিষয়টি আমার খুবই মনোগ্রাহী ছিল। কিন্তু আমার প্রথম অধ্যক্ষ অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য আমার মনের মতন গুরু এবং নিঃসন্দেহে এ-দেশে নবযুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, মৌল চিন্তার ক্ষেত্রে অতুলনীয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের Professors Room-এ বসে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সম্ভব ছিলো না, হলটা ছিল অধ্যাপকদের আড্ডা দেওয়ার জায়গা। মাসে দু'মাসে তাঁর বাড়িতে যেতাম শ্রীরামপুরে, স্টেশন থেকে দু'মাইল পথ হেঁটে। যখন যেতাম তখন আমি ধন্য হয়ে ফিরতাম। ...এ দেশের দার্শনিক মহলে (আমি) সাড়া জাগাতে পারতাম হয়তো। কিন্তু এ-দেশে সে-রকম দার্শনিক মহল কোথায়? ...দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে এ-দেশে সামপ্রতিক দার্শনিক চিন্তা মুমূর্ষ, অন্তত জরাজীর্ণ।' দর্শনচর্চার পরিমণ্ডলের অভাবে আইয়ুবের হতাশার এই বর্ণনাটি (যেটি বর্তমান উদ্ধৃতি - তে অতি - সংক্ষেপিত) পড়ে, আমার ইচ্ছা হয় সক্ষোভে আমি আইয়ুবকে বলি যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্য বিশ্বের সেরা মনীষীরা ছিলেন, কিন্তু বাঙালি দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের জন্য তো আপনি ছাড়া কেউ ছিলেন না। কেন আপনি, রবীন্দ্রকাব্যে সম্পূর্ণ মজে না গিয়ে, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে আপনার দর্শন-আলোচনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করে রাখলেন না? কী করে বাংলার জল মাটি কবিতার মোহ-ঘোর আপনার মতো দুর্জয় জ্ঞানান্বেষীকেও শেষপর্যন্ত দর্শনের মানমন্দির থেকে কাব্যের মায়াকাননে সরিয়ে নিয়ে গেল?

সকলেই বোধ করি আশ্চর্য হবেন কাব্যের বিপক্ষে এবং দর্শনের পক্ষে আমার এই আক্ষেপধ্বনি শুনে, কারণ আমি নিজে একজন কবি, এবং কবিদের দর্শনের কাছ থেকে শত হস্ত দূরে থাকারই কঠোর বিদান। কিন্তু কী করব, দর্শন আমার প্যাশন, এবং আমি মনে করি যে বাংলার কাব্য - উর্বর জল- মাটিতে হাজারে হাজারে বাঙালি কবি জন্মাচ্ছে ঝরে যাছে (আমিও সেই কষণজীবীদেরই একজন), কিন্তু একজনও বাঙালি দার্শনিক জন্মাচ্ছে না, কিছুতেই না, এটা বাঙালি জাতির মতো একটি আধুনিক, মননশীল এবং সুশিক্ষিত জাতির পক্ষে এক চরম লজ্জার কথা। যে-জাতির মধ্যে নোবেল জয়ী কবি এবং অর্থীতিবিদ আছেন, আতন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক প্রমুখ যশস্বী বিদ্দানেরা আছেন, সেই জাতির মধ্যে একজনও নামোল্লেখযোগ্য মৌলিক দার্শনিক নেই, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা নয় কি? সেজন্যই, যখনই আইয়ুবের লেকা পড়ি, তখনই মন খারাপ হয়ে যায়। কারণ তখনই দেখতে পাই একজন প্রবল সম্ভাবনাময় দার্শনিকের কাব্য - সরোবরে নিমজ্জন। আমি দেখতে পাই, কাব্য - সমালোচক হিসাবে আজ আইয়ুবের প্রতি সম্মান - জ্ঞাপনার্থে, বাঙালি জাতির কাছে আমার দুটি বিনীত প্রস্তাব আছে।

এক, কলেজ - শিক্ষার সকল বিভাগে, প্রথম বর্ষে দর্শন-পাঠ আবশ্যক। হোক। একটি মনোজ্ঞ পাঠ্যগ্রন্থে দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃথিবীর প্রদান দর্শন - তত্ত্বগুলির সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন শিক্ষার্থীদের জ্ঞানলাভের জন্য পরিবেশিত হোক। এবং দুই ফিজিকস অনার্স -এ ভর্তির জন্য যে যোগ্যতামান নির্ধারিত আছে, ফিলজফি অনার্স-এ ভর্তির জন্যও সেই একই যোগ্যতামান নির্ধারিত হোত। অন্যথায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন -এর সকল বিভাগ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হোক। এবং বর্তমান ব্যবস্থায় দর্শন শিক্ষার নামে বাঙালিদের যে লজ্জাকর অ্যাকাডেমিক প্রহসন চালু আছে, তা চিরতরে বন্ধ হোক।

।। দুই।।

এবারে আসি কাব্য - সমালোচক আইয়ুবের কথায়, আধুনিকতার কথায়, এবং আধুনিক কবিতার প্রতি আইয়ুবের গভীর দার্শনিক বীতরাগের কথায়।

এই লেখাটির শুরুতেই আমি বলেছি যে আইয়ুবের দার্শনিক -সত্তা এবং কাব্য - সমালোচক - সত্তার দ্বান্দ্বিকতা আমার মনে একটি প্যারাডক্স-এর আভাস আনে। আমি দেখতে পাই, আইয়ুব যখন দার্শনিক, তখন তিনি সচেতন জড়বাদী; কিন্তু যখন তিনি কাব্য - সমালোচক, তখন তিনি বিনা দ্বিধায় ভাববাদী। এবং যেহেতু তাঁর কাব্য - সমালোচনা ছত্রে ছত্রে দর্শন-ভিত্তিক, সেকারণে তাঁর প্রতিটি লেকায় ভাবাবাদ - জড়বাদের বিষম বুনোটে আভাসিত তাঁর লেখক সত্তার এই প্যারাডক্স।

এই প্যারাডক্সটি পূর্ণতম উদ্ভাসিত রূপ আমি দেখতে পাই আইয়ুবের 'গীতাঞ্জলি বিষয়ে একটি ব্যক্তিগত সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে। আমি দেখতে পাই যে এই প্যারাডক্সটি হল, সংক্ষেপে, একজন নাস্তিক দার্শনিকের আস্তিক কাব্যে গভীর অনুরাগের প্যারাডক্স। নাস্তিক দার্শনিক আইয়ুবের আস্তিক রবীন্দ্রকাব্যে গভীর অনুরাগের প্যারাডক্স। আসুন, আমরা আইয়ুবের নিজের জবানিতেই এই কূটাভাসটির বর্ণনা শুনি। উক্ত প্রবন্ধে আইয়ুব বলেছেন :

'এর (গীতাঞ্জলি-র) অধিকাংশ গান শুনে আমি মুগ্ধ হই, এমন-কি সুর বাদ দিয়ে শুধু কবিতারূপে পাঠ করলেও আমার

মন গভীরভাবে সাড়া দেয়। প্রেমের অভিজ্ঞতা আমার নেই মেন কথা বলবো না। কিন্তু ঈশ্বর - বিষয়ক যে - কোনোপ্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমি বঞ্চিত। শব্দ (authority) প্রমাণ হিসেবে আমার কাছে একেবারে অগ্রাহ্য, শুধু অগ্রাহ্য নয়, অশ্রদ্ধেয়। এবং দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তার পথে বিপথে যতো এগিয়েছি, ঈশ্বরে বিশ্বাস আমার ততোই ক্ষীণ হয়েছে; অবশেষে আজ পৌঢ়ত্বের প্রান্তে পৌঁছে বাল্যকালের পরম আশ্রয়দাতা, পরম কল্যাণময়, অনন্ত শক্তিধর, সকল দুঃখতাপহর কোনো বিশ্ববিধানকর্তাকে তো আর কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ যে ব্যক্তিস্বরূপ ঈশ্বরকে গ্রহণ করতে আমার মনের প্রতিটি কক্ষে প্রবল প্রতিরোধ, সেই ঈশ্বরপ্রেমের আদ্যোপান্ত অনুরঞ্জিত কাব্যকে হৃদয়ে স্থান দিতে একটুও বাধে না। কেন বাধে না, এ-প্রশ্ন আমাকে তরুণ বয়স থেকে ভাবিয়েছে।'

এ-কথার একটু পরেই, প্রবন্ধটির মূল আলোচনায় প্রবেশের আগেই, আইয়ুব অকপটে জানিয়ে দিয়েছেন এই প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়াসে তাঁর শেষ কথাটি, '...যে ঈশ্বরকে আমি কায়মনোবাক্যে অলীক বলে জানি, সেই ঈশ্বরভাবে ভরপুর কাব্যে মন কেন সাড়া দেয়? আমি পেশাদারি নিস্তাপ সাহিত্যিক বিচার বা ঐতিহাসিক মূল্যায়নের কথা বলছি না...আমি বলছি কাব্যের সেই সংরক্ত আবেদনের কথা যাতে সমস্ত মন প্রাণ মুচড়ে ওঠে। প্রশ্নের কোনো উত্তর পাইনি সে-দিন। আজও তার উত্তর খুঁজছি। কিছুক্ষণের জন্য পাঠককেও সেই খোঁজার শরিক করে নিতে চাই।'

অর্থাৎ তাঁর নিজের বিচারেই, প্যারাডক্সটি অমীমাংসিত। কেবল ঘুরে - ফিরে এইটর মীমাংসা সন্ধানেই তিনি ব্যাপৃত এবং বর্তমান নিবন্ধে তিনি পাঠককেও সেই সন্ধানের শরিক করতে আগ্রহী। আমরা, আধুনিক মানুষেরা, তন্মুহূর্তে তাঁর এই সন্ধানের শরিক হয়ে যাই, কারণ আমরা, আধুনিক মানুষেরা, নিজেদের চোখের পাতা ফেলার আগেই বুঝতে পারি যে এই প্যারাডক্সটি আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই জ্ঞানত-অজ্ঞানত কম - বেশি বিদ্যমান; যে কোনও মহৎ শিল্পের, মহৎ সৌন্দর্যের বা মহৎ ভাবের দ্বারাভিভূত হলেই আমরা আমাদের মনের অন্তঃস্থলে এই প্যারাডক্সটির অস্তিত্ব টের পাই, এবং কিছুটা যুক্তি দিয়ে এটিকে বুঝতে চাইলে একটা মন-প্রাণ মুচড়ে - ওঠা অনুভূতির ধাক্কায় ঈষৎ বেসামাল হয়ে যাই। আইয়ুবের কৃতিত্ব এই প্যারাডক্সটিকে, নিজের ব্যক্তিজীবনের সাক্ষ্যে, প্রশ্নাকারে, সূত্রবদ্ধ করলেন। একটি অতি - চেনা অথচ অতি অচেনা স্ববিরোধকে — আধুনিকতার জন্মলগ্ন থেকে উদ্ভূত একটি স্ববিরোধকে কার্পেটের তলায় গুঁজে না রেখে অকপট স্বীকারোক্তিকে উত্থাপন করলেন। আমরা এই প্যারাডক্সটির নাম দিতে পারি 'নাস্তিকের গীতাঞ্জলি' প্যারাডক্স।

আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি, এই প্যারাডক্সটি, ব্যক্তিমানুষের বিশ্বদৃষ্টির ক্ষেত্রে, একটি কেন্দ্রীয় দার্শনিক প্যারাডক্স : নাস্তিকতার এবং আধ্যাত্মিকতার, জড়বাদের এবং ভাববাদের অবিরাম দ্বন্দ্বযুদ্ধে অভিব্যক্ত একটি রণ-ক্লান্ত, মহাকাব্যিক প্যারাডাক্স। এবং আমার চোখে আইয়ুব এই পবিত্র দার্শনিক প্যারাডক্সটির এক শুদ্ধতম প্রতিমূর্তি। আলোচ্য প্রবন্ধে আইয়ুব নিজেই, তাঁ অন্যাসাধারণ ভাষায়, তাঁর এই প্যারাডক্সিক্যাল আত্ম - প্রতিকৃতিটির সুস্পষ্ট বর্ণনা করে গেছেন এই বলে:

'স্রষ্টা, বিধাতা এবং ত্রাণকর্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করা যদিচ আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবু আমি কোনো অর্থেই জড়বাদী নই। মানুষের সমগ্র সত্তা শরীরবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের ছকে কোনোদিন ধরা দেবে—এ-কথা আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারি না। এমন-কি আমার বিশ্বাস, জড়জগতের একটা চিত্রমাত্র পদার্থবিজ্ঞানে অনুরেখনীয় ও অনুধাবনীয়। অর্থাৎ যদিচ বিজ্ঞান আমার চোখে অতীব শ্রদ্ধেয় ও প্রণিধানযোগ্য, তবু আমি ভুলতে পারি না যে, অনেকান্ত বিশ্বজগতের একটা অন্ত বা দিক-মাত্র বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত, বাকিটা ধরাছোঁয়ার বাইরে, অপর গভীর রহস্যে ঢাকা।' —বস্তুতপক্ষে তাঁর এই বিস্ময়কর ও বলিষ্ঠ আত্ম - ঘোষণা এই প্যারাডক্সটিকে ভাববাদ - জড়বাদের একটি অর্ধনারীশ্বর চোলা ব্রোঞ্জ-মূর্তির শক্তি, সৌন্দর্য এবং উজ্জ্বলতা দিয়েছে। প্রচলিত দর্শনের বিচারে আইয়ুব একজন স্বঘোষিত বুদ্ধিবাদী বিজ্ঞানবাদী নাস্তিক; সুতরাং তিনি নিশ্চতই জড়বাদী। কিন্তু তা - সত্ত্বেও তাঁর এই স্ববিরোধী আত্মঘোষণা আসলে প্রচলিত দর্শনের জড়বাদ ও ভাববাদের কখষ বিভাজনের (Compartmentalisation) বিরুদ্ধে এক মরিয়া বিদ্রোহ।

যাই হোক, যে - প্যারাডক্সটি আমাদের আলোচ্য, সেটির বিষয়ে আমি আইয়ুব - বিষয়ক অন্য একটি নিবন্ধে, বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। যেহেতু আইয়ুব সম্পর্কে আমার মূল বক্তব্য এই প্যারাডক্স - ভিত্তিক, সেকারণে বর্তমান নিবন্ধেও পূর্বোক্ত নিবন্ধের কিছু কথা পুনরুক্তি অনিবার্য। এবং যেহেতু এই প্যারাডক্সটি আধুনিকতারই একটি ব্যাসকূট, সুতরাং আধুনিকাত বিষয়েও কিছু কথার পর্যালোচনা প্রয়োজন। এই কথা পর্যালোচনা প্রয়োজন। এই কথা মূলত তিনটি। প্রথম কথা, আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে আইয়ুবের প্রধান যে-দুটি অভিযোগ,, কাব্যভাষার স্বেচ্ছাচারিতা এবং অমঙ্গলবোদের মাত্রাধিক্য—সে দুটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা। কাব্যভাষার স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগটি অনেকটাই আইয়ুবের ব্যক্তিগত পক্ষপাত - নির্ভর, এটি কাব্যভাষার সহজাত প্রতীকধর্মিতা ('খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়'—এই পঙ্‌ক্তি কোনও আধুনিক কবির রচনা নয়), এবং নিত্যনব স-জন-নিরীক্ষার প্রাথমিক সত্যটির দ্বারা নিষ্পন্ন নয়, সুতরাং এটির বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে বোদেলেয়ার - র‍্যাঁবো - মালার্মে - ভালেরি-এলিয়ট-রিলকে প্রুখ আধুনিক মহারথীদের কাব্যভাষার নতুন, বিস্ময়কর সৃজনশীলতার শক্তিকে আইয়ুব ধরতে পারলেন না। কিংবা, 'ধরতে পারলেন না' বলা ধৃষ্টতা (কারণ আইয়ুবের মতো কাব্য-সংবেদী মন ক'জনেরই বা আছে), বলা উচিত, মানতে পারলেন না। এবং তাঁর এই মানতে না পারার প্রকৃত কারণ তাঁর দ্বিতীয় অভিযোগটি, অর্থাৎ আধুনিক কবিতায় অমঙ্গলবোধের মাত্রাধিক্য। 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনার্থ গ্রন্থটির 'পূর্বাভাষ' -এ আইয়ুব বলেছেন, '(আধুনিক কবিতায়) জাগতিক অমঙ্গলবোধ বিষয়ে চেতনার অত্যাধিক্য—আমাকে অধিকতর পীড়িত করে। একজন পাশ্চাত্য সাহিত্যবিশারদ বলেছেন, এ-যুগের (বোদেলেয়র - পরবর্তী যুগের) সাহিত্যের চারিত্র্য হচ্ছে 'an overwhelming consciousness of evil'; অর্থাৎ আধুনিক সাহিত্যিকরা চারিদিককার দুঃখ ও পাপ সম্পন্ধে শুধু সচেতন নন, এই অমঙ্গলবোধ তাঁদের চেতনাকে অভিবৃত করে রেখেছে। জগৎ ও জীবন বিষয়ে আনন্দ, আগ্রহ, শ্রদ্ধা, বিস্ময় এমনকি কৌতূহল পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে তার জায়গা জুড়েছে বোর্‌ডম, বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, বিবমিষা।' আধুনিকদের এই অমঙ্গলবোধের সর্বাত্মক বিরুদ্ধতাই ছিল আইয়ুবের সারা জীবনের দার্শনিক obsession এবং এই অমঙ্গলবোধের প্রথম

মহাকবি বোদলেয়ার ছিলেন তাঁর সকল কাব্যতাত্ত্বিক আক্রমণের প্রধান প্রতিপক্ষ। এতটাই ছিল এই অমঙ্গলবোদের প্রতি তাঁর বিবমিষা, যে তিনি তাঁর 'Poetry and Truth' গ্রন্থে একটি প্রবন্ধেরই নামকরণ করেছিলেন 'Overwhelming consciousncess of evil', এবং সেই প্রবন্ধে তিনি আধুনিকদের বিশ্ব - বিতৃষ্ণার বিপক্ষে বলেছিলেন এই কথা।

'The evolution of life from microbe to man, the evolution of man from pithecus anthropus to home Neanderthalensis and from the latter to Buddha, Socrates, Jesus, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Gandhi and Einstein is fact and not fiction. Sponataneous biological evolution might possibly have come to an end, but purposive human evolution has just begun. Human life is a great andenture, threatened by heavy odds, but not utterly without hope or aim.' এখানেও আমরা দেখতে পাব সেই জড়বাদ - ভাববাদের বিষম বুনোট। দেখতে পাব যে আইয়ুবের এই দৃপ্ত বক্তব্যের প্রথম অংশটি—অর্থাৎ প্রথম বাক্যটি — একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক জোরালো দার্শনিক যুক্তি: গুহামানব নিয়ান্ডারথাল থেকে মহামানব আইনস্টাইন—সত্যিই তো ফ্যাক্ট: বিবর্তন - বাহিত এক অনন্ত রহস্যময় ফ্যাক্ট; কোনও কাঁচা কল্পবৈজ্ঞানিক ফিকশন নয়! কিন্তু তারপরেই এই বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশটি —Purposive human evolution এবং মানবজীবন -এর great adventure -এর অংশটি—নিতান্তই ভাববাদী সুদুক্তি। আমি, আইয়ুবে এক মূর্খকিন্তু ফাজিল ছাত্রের মতন, তাঁকে বলতে পারি যে, 'স্যার, আপনার দুটো কথার পিঠে আমার দুটো কথা। এক, নিয়ান্ডারথাল থেকে আইনস্টাইন মানে মোটামুটি সত্তর হাজার বছরের ইতিহাস। সেই সত্তর হাজার বছরের হিসাব থেকে আপনি মোটে সাতজন মহামানবের নাম খুঁজে পেলেন, তাঁদের মধ্যেও দু'জন—বুদ্ধ এবং যিশু—আবার ধর্মপ্রচারক, যে ধর্মের ধারণায় আপনার ঘোর অনাস্থা। দাভিঞ্চি সমকামী, শেকসপিয়র সম্পর্কেও একই কানাঘুষো, সুতরাং মানুষ হিসাবে দু'জনের কেউই খুব সুবিধের নন। গান্ধী মহান, কিন্তু চরম ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং গোঁড়া। তাহলে আপনার তালিকায় বাকি রইল দুই —সক্রেটিশ এবং আইনস্টাইন—দু'জনেই মানবজ্ঞানের দুটি মহামূর্তি। কিন্তু মাত্র দু'জনের (দরে নিচ্ছি যে এই দু'জন মানে দ'শো বা দু'হাজার জন) এগজাম্পল দিয়ে কি অন্তত চল্লিশ হাজার বছরের হাজার হাজার কোটি হোমো স্যাপিয়েন্সদের জৈবিক জিঘাংসার এবং নীচতম স্বার্থবুদ্ধির শোষণ-ভিত্তিক সামজধারা জাস্টিফাই করা যাবে? না কি একথা ভাবতে হবে যে অন্য প্রাণীদের তুলনায় কিছু বেশি - পরিমাণ ঘিলু বিশিষ্ট মানুষ মূলত একটি ধূর্ত ও ধড়িবাজ প্রজাতি, যারা তাদের ভাষা, হাত, হাতিয়ার এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে এতাবৎ যা-কিছু হাসিল করেছে তার মূলে রয়েছে হিংসা, হরর, হাহাকার এবং হেডোনিজম? এবং একথা মানতে হবে যে কিছু মুষ্টিমেয় মনীষীদের মহৎ অবদান, শে, পর্যন্ত, এই প্রজাতির অসৎ, আমাদের উপাদানেই পর্যবসিত।

দুই, দোষ নেবেন না স্যার, কিন্তু আপনি যে বললেন sopontaneous biological evolution সম্ভবত শেষ হয়ে এসেছে—এই কথা আপনি কোথায় পেলেন, এই অনুমানের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কী? এবং আপনার 'purposive humanevolution' কথাটিতে তো বের্সসঁ-র সেই বহুনিন্দিত 'creative evolution'-এরই সন্দেহজনক গন্ধ। আপনি নিজেই তো আপনার যৌবনকালের একটি সাড়া-জাগানো প্রবন্ধে ('বুদ্ধিবিভ্রাট ও অপরোক্ষানুভূতি') বের্গসঁ-র এই Intellect বিদ্বেষী এবং intuition ধর্মী দর্শনকে প্রবল বৌদ্ধিক যুক্তির আঘাতে ধরাশায়ী করেছিলেন! এবং ওই যে বললেন, 'Human life is a great adventure' সেটা কার অ্যাডভেঞ্চার, এই অ্যাডভেঞ্চার -এর কর্তা কে? এটি কি ব্যক্তিমানুষের সচেতন ইচ্ছার (conscious will) কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য-অভিমুখী অ্যাডভে+চার (এবং তার প্রজাতিগত অভিযাত্রা), না কি ক্ষুদ্র মনুষ্যজীবনকে ভিত্তি করে নিরাকার বিশ্ব-সত্তার নিরীক্ষামূলক অ্যাডভেঞ্চার? Will of the individul, will of the species, না will of the cosmos ?

কিন্তু এখানে এসব কুতর্ক আমি তুলব না। কারণ আগেই বলেছি, আইয়ুবের রচনায় এই জড়বাদ - ভাববাদের বিষম বুনোটাই আমার কাছে সেই পবিত্র প্যারাডক্স — যেটি একই সঙ্গে মানুষের জ্ঞান-চর্চার অন্তিম দ্বন্দ্ব এবং দিশা।

(এ জাতীয় নিড়ি - পাঠে একটি গুরুতর সমস্যা যেন - বা দৃষ্টিগোচর হয়। সেটি হল কাব্য - সমালোচনার ভাষার সমস্যা। খুব সংক্ষেপে সমস্যাটি এই : কাব্য ভাবলোকের বস্তু, সুতরাং সে তার নিজস্ব প্যাশন - এর ভাষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বয়ংসিদ্ধ। কিন্তু কাব্য - সমালোচনার ভাষা বুদ্ধিলোকের বস্তু — রিজন আশ্রিত; ফলে সেই ভাষা প্যাশনকে রিজন -রে মুদ্রয় ব্যাখ্যা - বিচার করার অন্তর্নিহিত ফ্যাসাদে প্রতিপদে বিপদগ্রস্ত। প্রায়শই দেখা যায় কাব্য - সমালোচনার ভাষা যতক্ষণ জ্ঞানলোককে সচেতনভাবে পরিহার করে সম্পূর্ণগত ভাবলোকের এবং রসলোকে সংযুক্ত থাকে, অর্থাৎ গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করে, ততকষণ সেই ভাষা মোটামুটি এই সংকট-মুক্ত; কিন্তু ভাবলোকের আলোচনায় জ্ঞানলোককে টেনে আনা মাত্র বিপত্তি ঘটে। অর্থাৎ ওয়াল্টার পেটার পার পেয়ে যান, কিন্তু ওয়াল্টার বেঞ্জামিন হয়তবা ঠেকে যান। এই প্রসঙ্গটি একটি ভিন্ন প্রবন্ধের দাবি রাখে। আমি সূত্রাকারে এই সমস্যাটিকে এখানে উত্থাপন করলাম মাত্র।)

দ্বিতীয় কথা, আধুনিকতার সংজ্ঞা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে আইয়ুবের মতো সংজ্ঞানিষ্ঠ দার্শনিকও তাঁর অসামান্য গ্রন্থ 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' -এর বিস্তৃত পরিসরে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষ নিয়ে আধুনিকতার আগাগোড়া আক্রমণ করা সত্ত্বেও, কোথাও আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করেননি; বরং এ-কারণে সমালোচিত হয়ে, গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় খুব লঘুসুরে —প্রায় দার্শনিক আইয়ুবের পক্ষে বেমানান সুরে —বলেছেন, 'আধুনিকতার কোনো সংজ্ঞা দিইনি কেন, কোনো - কোনো সমালোচক ভর্ৎসনা করেছেন। সংজ্ঞা দেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিলো...(কারণ) 'আধুনিকতার'-র ধারণা স্বভাবতই গতিশীল, ধাবমান। সেকালের যৌবনমদমত্ত আধুনিকতা একালে লোলচর্ম, পঞ্চাশ কি একশো বছর পরে বেজায় সেকেলে হয়ে যাবে।' তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ দ্বিমত। পস্তুতপক্ষে গোটা গ্রন্থটি জুড়ে যে-আধুনিকতা ও তৎসঞ্জাত অমঙ্গলবোধ আইয়ুবের বিচার্য, সেই আধুনিকতা স্পষ্টতই আমাদের অতি পরিচিত, রেনেসাঁস - প্রসূত আধুনিকতা—একটি ইতিহাস—নির্দিষ্ট স্থিরসংজ্ঞা - বিশিষ্ট আধুনিকতা — আমরা সকলেই যে - আধুনিকতার গর্বিত সন্তান। এই আধুনিকতা হল পাশ্চাত্য রেনেসাঁস - উদ্ভুত যুক্তিবাদ জড়বাদ - বিজ্ঞানবাদ - নিরীশ্বরবাদ- মানবতাবাদ সংশ্লেষিত এক আত্মগর্বী, ব্যক্তিবাদী আধুনিকতা। উক্ত গ্রন্থটিকে এ সংজ্ঞাটির উল্লেখ বিশেষ জরুরি ছিল। যাই হোক, এই বহু-স্তরিক, বহু - যোগিক আধুনিকতার মূল ভিত্তি কিন্তু

একটিই; সেই ভিত্তিটি আমার মতো, নাস্তিকতা। একজন আধুনিক মানুষ মানে একজন নাস্তিক মানুষ। যে-মানুষ নাস্তিক নন, তিনি, শেষ বিচারে, আধুনিক নন। কারণ ডারউইনীয় বিবর্তনবাদের মূষলাঘাতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মৃত্যু থেকেই আধুনিকতার জন্ম (যে কারণে, আমার বিবেচনায়, মানব - ইতিহাসে আধুনিকতার জন্মদিবস ১৯৫৯ সালের ২৪ নভেম্বর, যে - দিন ডারউইনের 'অরিজিন অব স্পিসিস' গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ঘটল)। এবং এই আধুনিকতার বোধের একটি বড় প্রত্যয় হল বিচ্ছিন্নতাবোধে, 'ব্যক্তি বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন' —এই বোধ, এবং সেই বোধের ফলে, নির্বিকার নির্মম বিশ্বের ভিতরে অসহায় ব্যক্তির বেঁচে থাকার বিপন্নতার বোধ, তার সদা - উদ্বিগ্ন চিত্তে অমঙ্গলে বোধ। এখন, একজন মানুষ একই সঙ্গে বিশ্ব থেকে ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতাবোধে বিশ্বাসী এবং বিশ্ব - স্রষ্টা মঙ্গলময় ঈশ্বরে বিশ্বাসী —এটা হয় না। সেজন্যই নাস্তিকতা হল আধুনিকতার মূল জন্মবীজ, এবং তার অন্দিম পাসওয়ার্ড। সুতরাং আধুনিকতার দর্শন — যা মূলত হাইডেগার থেকে সার্ত্র অব্দি বিভিন্ন দার্শনিক প্রণীত নাস্তিক অস্তিত্ববাদের দর্শন—একথা মনে করে যে যেহেতু জগতে কোনও ঈশ্বর নেই, সেহেতু এই জগতের কোনও বিষয়গত মূল্য (objective values) নেই। এই অচেতন বিশ্বে সচেতন সাদা - বিপন্ন ব্যক্তির বেঁচে - থাকা শুধুমাত্র তারই দায়। উৎকণ্ঠাই ব্যক্তির একমাত্র নিয়তি। এই বিশ্ব বিষাদময়। বৃহৎ নাস্তির ভিতর ক্ষুদ্র অস্তি-র বিষণ্ণ বিনাশই একমাত্র জগৎসত্য। সেকারণে এই আধুনিকতার দর্শনে বিশ্বাসী মানুষদের মনে, আধুনিক কবিশিল্পীদের মনে, এক গভীর নৈরাষ্যবোধ, ডিস্এনচান্টমেন্ট অব দ্য ওয়ার্লড—বিশ্ব - বিতৃষ্ণা।

বলাই বাহুল্য যে আইয়ুব এই অস্তিত্ববাদী দর্শনের ঘোর বিরোধী। প্রাচীন দার্শনিকদের মতো তিনিও মনে করেন যে 'বিস্ময়ে দর্শনের সূত্রপাত : কবিতারও শুরু সেইখানে। ...মানুষ যে কেবল জৈবজগতের অধিবাসী নয়, অধ্যাত্মলোকেরও পরিব্রাজক, তারই অভিজ্ঞান রয়েছে এই শ্বাশ্বত বিস্ময়বোধে। বিস্ময়বোধের অবলুপ্তিকে তাই আমি কাব্যের প্রগতি বলে মেনে নিতে কুণ্ঠিত।' (অমঙ্গলবোধ ও আধুনিক কবিতা) আমরা লক্ষ করব যে বিস্ময়বোদের পক্ষে এবং বিচ্ছিন্নতাবোধের বিপক্ষে আইয়ুবের এই দার্শনিক অবস্থানটি, বস্তুতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক দর্শনের অন্তর্গত। এবং মজা এই যে বাস্তবতার বিচারে, আধুনিক দর্শনের বিচ্ছিন্নতাবোধের ধারণাটির তুলনায় ক্লাসিক দর্শনের বিস্ময়বোধের ধারণাটি অধিকতর বিজ্ঞান - সম্মত। কারণ, বিশ্বের উপাদানেই ব্যক্তি - প্রাণের সৃষ্টি, এবং বিশ্বের প্রতি মুহূর্তের দানেই সেই ব্যক্তি - প্রাণের পুষ্টি এবং তুষ্টি। সেই বিশ্ব থেকে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন— এই ধারণাটি নিতান্ত অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক, এবং ভ্রান্ত। (এই প্রসঙ্গে, 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের এই যুগল - উক্তিই আমার কাছে দর্শনচিন্তার দুটি শ্রেষ্ঠ ধ্রুবপদ: ১। 'আমার স্বাতন্ত্র্যগর্ব নাই— বিশ্বের সহিত আমি আমার কোনো বিচ্ছেদ স্বীকার করি না।'

২। 'আমি, কি আত্মার মধ্যে কি বিশ্বের মধ্যে, বিস্ময়ের অন্ত দেখি না।')

আধুনিকতার দর্শনে কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতাবোধটি প্রায় এক মরমি মাহাত্ম্যে উন্নীত। এই মাহাত্ম্যের বর্ণনায় আধুনিকেরা যে গালভরা দার্শনিক কথাটি ব্যবহার করেন, সেই existential angst বা আস্তিত্বিক উৎকণ্ঠা বস্তুতপক্ষে একটি narcissistic sentimenent,জড়বাদী নাস্তিকের একটি ভাববাদী আত্ম - সর্বস অভিমান মাত্র। এই অভিমান, আবারও বলছি, অবাস্তব, স্ববিরোধী এবং অবৈজ্ঞানিক। শুধুমাত্র এই অভিমানটির অবচেতনে, বিশ্ব-মাতার স্নেহলাভের জন্য ব্যক্তি - প্রাণের যে বালকোচিত আবদার, সেই আবদারটুকুই এই অভিমানটির সৌন্দর্য। এবং যে-মুহূর্তে বিশ্ব থেকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার এই ধারণাটিকে বৈজ্ঞানিকভাবে নাচক করা যায়, সেই মুহূর্তে আধুনকতার 'বিপন্ন বিস্ময়' -এর ধূরস চশমাটি মানুষের চোখ থেকে খসে গিয়ে অপার রহস্যময় বিশ্বপ্রকৃতির দিকে তার বিশুদ্ধ বিস্ময়ের ক্লাসিক মুগ্ধদৃষ্টি ফিরে আসে। অর্থাৎ বিপন্ন বিস্ময় থেকে বিসুধব বিস্ময়ে ফিরে আসতে মানুষের দরকার শুধুমাত্র একটি স্বচ্ছ শর্ট-কার্ট বিজ্ঞানদৃষ্টি; কোনও অতিলৌকিকতার প্রয়োজন নেই। একারণে, আধুনিকদের 'বিশ্ব-বিতৃষ্ণা'-র দর্শনের বিরুদ্ধে আইয়ুবের দার্শনিক সওয়ালের সঙ্গে অমি সম্পূর্ণ একমত। আমি মুগ্ধ হই যখন এই সওয়ালের পাঞ্চলাইন হিসাবে আইয়ুব বলেন, 'দুঃখ ও পাপের যুগ্ম সত্তাকে ইংরেজিতে evil বলে অভিহিত করা হয়, তারই বাংলা করেছি অমঙ্গল। দর্শনশাস্ত্রে এবং ধর্মশাস্ত্রে প্রবলেম অব ঈভিল এক বহু প্রাচীন এবং আজো পর্যন্ত নাছোড়বান্দা সমস্যা। ইদানীংকালে তা সাহিত্যকেও পেয়ে বসেছে—ঠিক দার্শনিক সমস্যাটি নয়, জগতের মধ্যে অমঙ্গলের কেচ্ছত্র আধিপত্য। দুঃখ ও পাপের মাত্রা আধুনিককালের আগের চেয়ে বেড়েছে কি না এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে, কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের উপর তার ছায়া যে অতিবৃহৎ আকার ধারণ করেছে তাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। প্রতিবিম্ব বিম্বকে আয়তনে এবং বর্ণের কালিমায় বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছে বলে আমার বিশ্বাস।' (অমঙ্গলবোধ ও আধুনিক কবিতা)। যুক্তি এবং বাস্তবতার বিচারে আইয়ুরে এই ধুরন্ধর পর্যবেক্ষণ একশোভাগ সঠিক, এবং এটি সকল আধুনিক কবিদের পক্ষে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। (যদিও এখানে আইয়ুবের 'অমঙ্গল' -এর সংজ্ঞাটির সঙ্গে, 'দুঃখ ও পাপের যুগ্ম সত্তাকে'—ই evil বা অমঙ্গল বলার সঙ্গে—আমি কিঞ্চিৎ দ্বিমতত। কারণ আমার মতে মানুষের অমঙ্গলবোধ হল, প্রথম এবং প্রধানত, এক অনির্দেশ্য অশুভের বোধ, এক অতিপ্রাকৃত ভয়ের বোধ। দুঃখ ও পাপের ধারণা দুটি বৌদ্ধিক ধারণা (intellectual concept), কিন্তু অমঙ্গলের ধারণাটি অতিলৌকিক ধারণা (supernatural concept)। সুতরাং দুঃখ ও পাপের বোধ অমঙ্গলবোধের বৌদ্ধিক অংশ মাত্র, তার আধিভৌতিক আশংকার সবটা নয়, এই আমার বক্তব্য)। যাই হোক, একথা তো ঠিক যে, আধুনিক সভ্যতার হাত ধরে আধুনিক মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত থেকে উন্নততর হয়ে চলেছে—জৈবিক - সামাজিক রাজনৈতিক সকল অর্থেই, সুতরাং এর উন্নতির ব্যাস্তানুপাতে আধুনিক মানুষের মন তেকে তো অমঙ্গলবোধের ধারণা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হওয়ার কথা। যদি তা না হয়, তাহলে বুঝতে হবে কোথাও তার আত্মদর্শনের ফুল ঘটে চলেছে। কোথাও তার মনে অতিপ্রাকৃতের বোধ রয়ে গেছে। তাকে সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে। যতই তার মনে বস্তুগত সুখ বাড়ছে, ততই তার মনে ভাবগত শূন্যতা বাড়ছে। —এই আস্তিত্বিক প্যারাডক্স -এর ব্যাখ্যা হবে কী প্রকারে? এখানেই, 'আধুনিকতা'-র পূর্ব কথিত রেনেসাঁস -উদ্ভূত সংজ্ঞাটির উল্লেখ জরুরি ছিল। কারণ, সেই সংজ্ঞাটির প্রেক্ষাপটে, আজ আমরা সবাই জানি যে আধুনিক মানুষের মনে এই ভাবগত শূন্যতার সংকট আসলে জড়বাদের এবং ব্যক্তিবাদের সংকট, বিশ্বাসহীনতার সংকট—নাস্তিকতার সংকট; ডেন -রে ভাষায়, এক 'vast spiri-

tual disorder'। পণ্ডিতদের ব্যাখ্যায়, আধুনিক যুগ এক 'এজ অব ডিসকন্টিনিউটি' (যেতেু আধুনিক মানুষ তাঁর কাঁধ থেকে অতীতের বোঝা এবং ঐতিহ্যের দায় ঝেড়ে ফেলতে চায়); আধুনিক মন এক 'ডিসইনহেরিটেড মাইন্ড', এবং আধুনিক মানুষদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের ভাষা 'মেটাফরস অব সাইলেন্স'। —এই সকলই আধুনিকতার ব্যাধি, আইয়ুব যেগুলির উল্লেখ বা বিবেচনা করেননি, করলে আধুনিক কবিরা হয়ত তাঁর কিঞ্চিৎ সমবেদনা উপহার পেতেন, কিন্তু তাতে তাঁর মূল ভর্ৎসনাটির সত্য কিছুমাত্র খারিজ হত না। সেই সত্যটি এই যে আধুনিকতার এক চূড়ান্ত জড়বাদী ব্যক্তিবাদী আস্তিত্বিক অভিমানে আধুনিক কবিদের আত্মজ্ঞান এবং বিশ্বদৃষ্টি প্রায়শই ব্যাবহত এবং বিভ্রান্ত হয়েছে। একজন কবির বিশ্বদৃষ্টি, সর্বকালেই, দার্শনিক বিচারে যথাসম্ভব নির্ভুল হওয়া চাই, যে-কারণে একজন কবিকে, নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায়, এক 'প্রোফাউন্ড ফিলজফার' হতেই হয়। আইয়ুবের সতর্কবাণী আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। দার্শনিক আইয়ুব নিজে এই জড়বাদী আধুনিকতার এবং একইসঙ্গে ভাববাদী আধ্যাত্মিকতার মতবাদ দুটি তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতার বিষয়ে কতদূর সচেতন ছিলেন, এবং এই সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে ওঠার উপায় বিষয়ে তাঁর মত কী ছিল, তার একটি সুচিন্তিত ও মূল্যবান বর্ণনা আমরা পাই Communion in poetry প্রবন্ধ : 'we are unable sincerely to believe in either traditional religions or in secientifie materisalism which is supposed to have replaced them. The former leaves our intellect rebellious and the latter our emotions perturbed. This was the root of Goethes's objections to transeendentalism and positivism as mere abstractions. Not a reconcilliation of science and feligion...but a reformulation of both religious and scientific outlooks is what is urgently needed today. Poets, theologians and phiolosopher have all to participate in this great adventure of the loul...'। বস্তুত এই সুস্থিত বক্তব্যটিই আইয়ুবের আদ্যোপান্ত দার্শনিক দোলাচলের একটি স্পষ্ট ভারসাম্য বিন্দু। (এখানেও আমরা লক্ষ করব যে যতই তিনি ঈশ্বরভক্তি বিরোধী হন, শেষ পর্যন্ত তিনি theologian - কে দল থেকে ছাড়লেন না!)

তৃতীয় কথা, অতিরিক্ত অমঙ্গলবোধ - এর অভিযোগ তুলে আধুনিক সাহিত্যকে আক্রমণ করতে গিয়ে আইয়ুবের দ্বারা শ্রেয়োনীতির মুদ্রায় আর্ট-এর বিচার। আইয়ুব নিজেই একটি স্মরণীয় প্রবন্ধে (শ্রেয়োনীতি ও সাহিত্যনীতি) বলেছেন, 'শ্রেয়োনীতির মেজাজকে সাহিত্যনীতিতে টেনে আনলে মর‍্যালিটি এবং আর্ট উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য।' কিন্তু বোদেলেয়ার এবং তাঁর অনুগামী আধুনিক কবিদের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে সেই দার্শনিক শ্রেয়োনীতির যুক্তিকেই টেনে এনেছেন।

তিনি লক্ষ করেননি যে এই সকল আধুনিক কবিদের কাব্যের মূলেও রয়েছে সেই একই বেদনাবোধ, যে বেদনাবোধ রবীন্দ্রনাথের বহু অবিস্মরণীয় গানের মূলে; এবং যে-কারণে সেই সব গান তাঁর (আইয়ুবের) বিচারে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। এ প্রসঙ্গে আরেকটি প্রয়োজনীয় কথাও বলার যে, কাব্যরচনা, পদ্ধতিগতভাবেই, একটি সম্পূর্ণ ভাববাদী প্রক্রিয়া; এই অর্থে যে, কবি তাঁর মনের একাগ্র ভাব দিয়ে বাস্তবতার ভাবসত্য উপলব্ধি করেন, এবং সেই উপলব্ধিকে একটি যথাযথ, সদ্য নতুন রসোত্তীর্ণ ভাষায় কাব্যরূপ দেন। কবিতার রস মূলত ভাবরস। এই বিচারে, 'আধুনিক কবি' কথাটির মধ্যেই রয়েছে একটি স্ববিরোধ (যেটি আমাদের আলোচ্য প্যারাডক্সটিরই অংশ) —সেটি এই যে 'আধুনিক' বিশেষণটি যদি এই বোঝায় যে কবি তাঁর বিশ্ব নিরীক্ষায় একজন যুক্তিবাদী জড়বাদী আধুনিক মানুষ, তাহলে তৎক্ষণাৎ তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে সেই আধুনিক মানুষটি আর কবি নন। কারণ কবিতা নামক মাধ্যমটির সৃজন প্রক্রিয়ার বাধ্যবাধকতার কারণেই একজন কবি তাঁর কাব্যরচনাকালে সম্পূর্ণত ভাববাদী। এই ব্যাখ্যানুযায়ী, আমরা এতটাই বলতে পারি যে 'আধুনিক কবি' বলে কিছু হয় না। সর্বকালের সকল কবিই ভাববাদী কবি। এই ভাববাদী চারিত্র্যের কারণে কবিতার এবং আর্ট -এর জগৎ মূলত স্পিরিচুয়াল, ঠিক যেভাবে দর্শনের জগৎ মূলত ইনটেলেকচুয়াল। দার্শনিকের অভীষ্ট ট্রুথ; কবির অভীষ্ট : ভিশন। ট্রুথ বিমূর্ত : যুক্তিময়, গণিতময়। ভিশন মূর্ত; প্রতিমাময়, গানময় এবং যেহেতু আর্ট -এর সৃজন প্রক্রিয়াটি স্পিরিচুয়াল, সেকারণে আর্ট তার ভাবাদর্শের স্বভাবগুণেই শ্রেয়োধর্মী, কোনও বাহ্যিক শ্রেয়োনীতির বিচার আর্ট -এর ক্ষেত্রে অনাবশ্যক।

এত কথার পর একটি ছোট্ট কথায় আমরা বলতে পারি যে আধুনিক কবিতা আইয়ুবের কাপ অব টি ছিল না। তার মোক্ষম প্রমাণ এই যে তাঁর রচনায় অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসুর উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু কোথাও বাংলা কবিতায় আধুনিকতার প্রাণপুরুষ জীবনানন্দের নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই। যতদূর শুনেছি, তিনি এতটাই অপছন্দ করতেন জীবনানন্দের কবিতা।

অথচ আমার চোখে ভাববাদ - জড়বাদের যে পবিত্র প্যারাডক্সটির এক শুদ্ধতম প্রতিমূর্তি আইয়ুব, সেই প্যারাডক্সটিরই এক সার্থকতম উপলব্ধি উৎকীর্ণ রয়েছে এই জীবনানন্দের একটি কবিতায়; 'মাটির নিঃশেষ সত্য নিয়ে গড়া হয়েছিল মানুষের শরীরের ধুলো:/ তবুও হৃদয় তার অধিক গভীরভাবে হতে চায় সৎ;' (প্রতীতী, সাতটি তারার তিমির)। 'মাটির নিঃশেষ সত্য' -কে অতিক্রম করে আইয়ুবের হৃদয়ও গভীরতরভাবে সৎ হয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় ব্রতী ছিল আজীবন। তাই, নাস্তিক দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও গীতাঞ্জলি -র আস্তিক কাব্যে আজীবন অভিভূত ছিল আইয়ুবের মন। কেন ছিল, তিনি সেই প্রশ্নের কোনও সঠিক উত্তর খুঁজে পাননি। আমরা এই প্রশ্নের কোনও চটজলদি উত্তর খুঁজব না, যতদিন না বিজ্ঞান কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অনিশ্চয়তা তত্ত্বের মতো নানাপ্রকার সম্ভাব্য তত্ত্বের সাহায্যে বিষয় এবং বিষয়ীর মধ্যে জড়বাদ এবং ভাববাদের মধ্যে একটি প্রকৃত সংযোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছে। ততদিন পর্যন্ত আমরা, নাস্তিক জড়বাদী আধুনিকেরাও, আইয়ুবের মতো, মনে - প্রাণে গীতাঞ্জলি-র কাব্যে অভিভূত হয়ে থাকব। যাতে চোখে ব্যক্তিবাদের টুলি পরা, অবৈজ্ঞানিক, অহং -সর্বস্ব আধুনিকতার দ্বারা আমাদের জ্ঞানদৃষ্টি ব্যাহৃত না হয়; যাতে আমরা আইয়ুব - কথিত 'গ্রেট অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সোল'-এ পরম আগ্রহে অংশ নিতে পারি।